গ্রামীণ অর্থনীতি, বউবাজার ও একটি সম্ভাবনা

উন্নয়ন

ড. খুরশিদ আলম

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট

বাংলাদেশ এখনও একটি গ্রামপ্রধান দেশ, যেখানে শতকরা ৭৮ ভাগ লোক বাস করে। এদের উৎপাদন এবং ভোগের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। গ্রাম এলাকায় হাজার হাজার হাটবাজার গড়ে উঠেছে, যার অনেকগুলো শতাব্দী প্রাচীন। এসব হাটবাজারের সংখ্যা ১৫ হাজারের অধিক হবে বলে ধারণা করা যায়। সরকার এসব হাটবাজার থেকে যেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছে, বিশেষ করে যেগুলো প্রতি বছর বেশি টাকায় ইজারা হয় সেগুলোকে উন্নয়নের আওতায় এনেছে। এমন ধরনের ২১০০ হাটবাজারকে গ্রোথ সেন্টার মার্কেট (জিসিএম) হিসেবে অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসা হয়।

এই জিসিএমগুলোকে অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় আনা হয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বা এলজিইডির মাধ্যমে। এই অবকাঠামো উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হলো বাজারগুলোকে কাঁচা থেকে পাকা করে দেওয়া এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া; যেমন– মাছ, মাংস, সবজি, মসলা, রকমারি পণ্য ইত্যাদি বিক্রির জন্য শেড তৈরি করা, টিউবওয়েল, টয়লেট, ড্রেন, রাস্তা, অফিসঘর ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেওয়া। বাজারের ভেতরের পুরো অংশই পাকা করে দেওয়া হয়, যাতে অনায়াসে সব ঋতুতে বাজার ব্যবহারকারীরা কোনো রকম কাদা-পানি না মাড়িয়ে বাজার ব্যবহার করতে পারেন।

বাজারকে একটি সংযোগ সড়কের মাধ্যমে প্রধান সড়কের সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া হয়, যাতে সেখানে পণ্যবাহী ট্রাক-ভ্যান সহজে চলাচল করতে পারে। এভাবে বর্তমানে অধিকাংশ জিসিএম উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায়। এ প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত আছে। অচিরেই এই ২১০০ জিসিএমের উন্নয়নের কাজ শেষ হবে।

সরকার হয়তো এর পর আবার নতুন করে জিসিএমের তালিকা তৈরি করবে। ওই তালিকায় নতুন গড়ে ওঠা বাজারগুলো থেকে কিছু কিছু বাজার এই উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় সরকার নিয়ে আসবে। যেসব বাজারের জন্য আগের তৈরি করা উন্নয়ন কাঠামো যথেষ্ট নয় বলে মনে হবে, সেগুলোতে নতুন করে আরও অবকাঠামো তৈরির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সরকার নেবে। এ কথা বলা দরকার যে, প্রতিটি জিসিএম উন্নয়নের জন্য সরকার উন্নয়ন বরাদ্দ থেকে কমপক্ষে ৩০ লাখ থেকে ৮০-৯০ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, সরকার যেসব জিসিএম উন্নত করে দিচ্ছে সেগুলো সাধারণত সাপ্তাহিক হাট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এসব হাট সপ্তাহে একবার কি দু'বার বসে। এ হাটগুলোতে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে দু'একটি তরকারির বা মাছের দোকান ছাড়া অন্য কোনো দোকান বসে না। স্থায়ী দোকানগুলোতে সপ্তাহব্যাপী যথারীতি ক্রয়-বিক্রয় হয়, তবে তার পরিমাণ হাটবারের চেয়ে অনেক কম। তাই সেসব দোকানদার হাটবারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন।

বর্তমানে এ ধরনের বাজারগুলো থেকে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ইজারা পাওয়া যায়। রাজশাহীর একটি হাট আছে যেটি বছরে দুই কোটি টাকার মতো ইজারা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে এই হাটগুলোতে বার্ষিক কী পরিমাণ বেচাকেনা হয়? এক হিসাব মতে, এ হাটগুলোতে বছরে প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়। কিন্তু এই বিশাল অবকাঠামো যা সপ্তাহে মাত্র দু'দিন ব্যবহার করা হয় (কোথাও কোথাও কেবল একদিন), বাকি সময় অব্যবহৃত থাকে। দেখে মনে হয়, জিসিএমগুলো খেলার মাঠের মতো খালি পড়ে আছে। এর কি কোনো বিকল্প ব্যবহার করা যায়? এগুলোর একটি বিকল্প ব্যবহার হতে পারে যদি এই হাটগুলোতে সপ্তাহে অন্তত একদিন 'বউবাজার' আয়োজন করা হয়। অর্থাৎ এই বউবাজার হতে পারে নারীদের জন্য বাজার, যেখানে আশপাশের নারীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে আসবেন, সব বিক্রেতা হবেন নারী; কিন্তু ক্রেতা নারী-পুরুষ উভয়েই হতে পারেন। এটি সকাল ৯-১২টা পর্যন্ত হতে পারে, যেখানে নারীরা তাদের তৈরি বা সংগৃহীত পণ্য বিক্রির জন্য নিয়ে আসবেন এবং তা সকাল সকাল বিক্রি করে ঘরে ফিরে যাবেন। ফলে বাড়ি ফিরে গিয়ে জরুরি অন্যান্য গৃহস্থালি কাজও তিনি সেরে নিতে পারবেন। এভাবে যদি ২১০০ জিসিএমে সপ্তাহে অন্তত একদিনও বউবাজার বসে এবং যদি এক লাখ টাকার পণ্যও বিক্রি হয়, তাহলে সপ্তাহে ২১ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি হবে। এ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনসহ ভ্যালু-চেইনে সপ্তাহে অন্তত দুই কোটি টাকা গ্রামীণ নারীদের হাতে চলে যাবে। বছরে ১১৩৪ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করা নারীদের পক্ষে সম্ভব হবে। এই পণ্য তৈরির জন্য নারীরা শ্রম ব্যবহারসহ কাঁচামাল ব্যবহার করতে পারেন অন্তত ৭০০-৮০০ কোটি টাকার।

> এই বিশাল অবকাঠামো যা সপ্তাহে মাত্র দু'দিন ব্যবহার করা হয়, বাকি সময় অব্যবহৃত থাকে। এগুলোর একটি বিকল্প ব্যবহার হতে পারে যদি এই হাটগুলোতে সপ্তাহে অন্তত একদিন 'বউবাজার' আয়োজন করা হয়। অর্থাৎ এই বউবাজার হতে পারে নারীদের জন্য বাজার, যেখানে আশপাশের নারীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে আসবেন, সব বিক্রেতা হবেন নারী; কিন্তু ক্রেতা নারী-পুরুষ উভয়েই হতে পারেন

এভাবে এটি গ্রামীণ ও জাতীয় অর্থনীতিতে একটি অসাধারণ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। এর মধ্যে দুটি বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে যার একটি হচ্ছে, কোনো একটি এলাকার নারীদের তৈরি করা কোনো পণ্য, একটি ব্র্যান্ড হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কোনো একজন নারী বা নারী দল বিশেষ উদ্যোক্তা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন। আর এখানে যে হিসাব করা হয়েছে, তা মাত্র সপ্তাহে এক লাখ টাকার পণ্য বিক্রি ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে সপ্তাহে ৮-১০ লাখ টাকা কেনাবেচা থেকে ধীরে ধীরে তা কোনো কোনো বাজারে কোটি টাকায়ও পৌঁছতে পারে, যদি ওই বাজারের বিশেষ কোনো পণ্য বিশেষ কোনো ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারে। এর যে কোনোটিই ঘটুক না কেন তা জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ অবদান রাখতে পারে। গোটা দেশের অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে।

লক্ষণীয়, এর জন্য সরকারের তেমন কোনো টাকা খরচ করার দরকার নেই। এটি সরকারের মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিসিক থেকে উদ্যোগ নিয়ে মাত্র ৫-৭ কোটি টাকা খরচ করে স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব। কিংবা কোনো এনজিওর মাধ্যমে করলে তা অতি অল্প খরচে বা বিনা খরচে স্থানীয় নারী মেম্বার, নারী সমাজকর্মী, উপজেলা নারী ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নারী বিষয়ক কর্মকর্তার সহায়তায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে উদ্যোগ নিয়ে যদি এ রকম একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়, তাহলে একজন নারী প্রকল্প পরিচালক দিয়ে তা সহজে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এর জন্য যে কোনো দাতা সংস্থা বিশেষ করে সুইডিশ সিডা বা নরওয়ের নোরাডের মতো দাতাগোষ্ঠী খুবই আগ্রহী হতে পারে। বিভিন্ন জেলার চেম্বারগুলোও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারে।

khurshed@bisrbd.org